পরিক্রমা

শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা এঁকে গেছেন স্বামী সারদানন্দজী লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে এবং তাঁর অমৃতময় কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে এযুগের হাতে তুলে দিয়েছেন শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অনুষঙ্গেই এসেছে শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গ। ঠাকুরের লীলাবসানের পরে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি তাঁর তারণকাজটি অনায়াসে করে গিয়েছেন যেটি মুখ্যত যুগাবতারের বিশেষ কৃত্য। শ্রীশ্রীমার লীলাসংবরণের পর (১৯২০) তাঁর কথার বা স্মৃতির সংকলন হিসাবে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে গ্রন্থের আকার নেয়। মায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী। বস্তুত বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ও তপস্যার দ্বারাই তাঁদের চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব।

আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বহু মানুষকে আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরের লীলাক্ষেত্রে এনেছিল। শ্রীশ্রীমা কিন্তু বরাবরই ছিলেন অন্তরালে ও অন্তঃপুরে। সেখানে অবস্থান করেই তিনি জেনেছিলেন যুগাবতারের লীলারহস্য, অনুধাবন করেছিলেন তাঁর এবারের অবতরণের সুগম্ভীর তাৎপর্য। সর্বোপরি তাঁর দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয়েছিল এবারকার লীলাবিগ্রহের স্বরূপ।

শ্রীশ্রীমার জানা-বোঝা ছিল অন্যরকম, বলতে গেলে অতুলনীয়। তিনি যে অন্যান্যবারের লীলাসঙ্গিনী সেকথাটিও ধীরে ধীরে তাঁর চিত্তমন অধিকার করে। বাস্তবিক নহবতের ওই ক্ষুদ্র ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন জগন্মাতাকে সকলের চোখের আড়ালে এবারের উপযোগী রূপদানে শিল্পীর মতন নিরলস ও সক্রিয়। অন্যদিকে শ্রীমাও সচেতনভাবে দেখছেন এই নতুন লীলার পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

তাঁর জন্ম অজ গ্রাম জয়রামবাটীতে যেখানে নবজাগরণের কোনও আলোই প্রবেশ করেনি। পড়াশোনা, 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য'-তেই শেষ। নিজের মহিমা ভুলে যেন এক দেববালা গাঁয়ের মেয়েটিই হয়ে গিয়েছেন—গলাসমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটছেন, ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, পঙ্গপালে ধান কাটলে মাঠে মাঠে ধান কুড়োচ্ছেন, কখনও বা ঠাকুরদেবতা গড়ে ফুলবেলপাতা দিয়ে পুজো করছেন। কচি মেয়ে কলসি করে জল আনতে শিখেছেন। কর্মপটুতা যেন তখনই তাঁর অঙ্গের অলংকার। পরবর্তী কালে ধান ভানা, পইতে কাটা, গরুর জন্য জাবনা দেওয়া, রান্নাবান্না—সবই করতে হয়েছে পিতার গৃহে।

পল্লীগ্রামের রীতি মেনে মাত্র ছয় বছরেই বিয়ে হল চব্বিশ বছরের গদাধরের সঙ্গে। নববধূর অঙ্গ থেকে অলংকার খুলে দিয়ে জননী চন্দ্রমণি দেবীকে নিশ্চিন্ত করলেন গদাধর। দক্ষিণেশ্বরে আবার তাঁকে অলংকার গড়িয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদুকে বলেছিলেন, ''ওর সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ।'' অন্য সময় তাঁর উক্তি : ''ও সারদা, সরস্বতী, সাজতে ভালবাসে।'' বিবাহের দুবছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জয়রামবাটী গেলে নিজের বুদ্ধিতে শিশু সারদা তাঁর চরণ ধুইয়ে তাঁকে বাতাস করেছিলেন।

চোদ্দো বছরের কিশোরী বধূ কামারপুকুরে এসে প্রথম প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ভালবাসার আস্বাদ পেলেন। ভালবাসায় হৃদয় জয় করে ঠাকুর প্রথমে তাঁর জ্ঞানরাশি ঢেলে দিলেন, পাঠ দিলেন ত্যাগোজ্জ্বল জীবনের। উচ্চ ধর্মজীবন লাভের জন্য

কীভাবে চরিত্র গঠন করতে হয় শেখালেন, অন্যদিকে শেখালেন সংসারে কেমন করে কর্তব্য পালন করে থাকতে হবে—গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। আবার লোকব্যবহারেরও পাঠ দিলেন—''যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।'' বাইরে গেলে কত সতর্ক থাকতে হবে শেখালেন। শ্রীশ্রীমার কাছে তিনি শিক্ষক, গুরু এবং একইসঙ্গে আনন্দময় প্রেমময় পতি। সারদার হৃদয়ের মঙ্গলঘটটি শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই পূর্ণ করে দিলেন আনন্দবারিতে—সে-আনন্দ পরিণত হয়েছিল ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে। এই উল্লাস তাঁর স্বভাবে ঘটিয়েছিল অদ্ভুত রূপান্তর, তাঁকে করেছিল শান্ত, চিন্তাশীলা, নিঃস্বার্থপ্রেমিকা আর মানুষের দুঃখকষ্টে অনন্ত সমবেদনাসম্পন্ন। কিশোরী তখনই পরিণত হয়েছিলেন সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁর কাছে পরম আনন্দময় দিব্যপুরুষ। তাঁর প্রশ্নে তাই পরে অনায়াসে উত্তর এসেছিল পল্লীবালার মুখে : ''আমি তোমাকে কেন সংসারপথে টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।'' শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার গুণে তাঁর অভীষ্টপথটি তখনই তিনি চিনেছিলেন। এরপর চার বছর জয়রামবাটীতে যখন বাস করছেন, তখন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কোনও আহ্বান আসেনি, বরং কানে এসেছিল তাঁর সম্বন্ধে নানান জল্পনা—শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মাদ, আর সেকথা নিয়ে গ্রাম্য ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। এসব কথার সত্যতা সম্বন্ধে সতীর সন্দেহ ছিল। সে-সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলেন। পিতামাতা, ভাইবোনের চেয়ে সেদিন প্রেমাস্পদের প্রতি প্রাণের প্রবল টানই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর আপ্যায়ন, স্নেহ-যত্ন। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। জানলেন তিনি কত কৃপাময়, কত তাঁর দরদ। এইসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষা শুরু করলেন। পত্নীকে সাংসারিক শিক্ষার সঙ্গে ভজন, কীর্তন, ধ্যান-সমাধি-ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সব বিষয়েই উপদেশ দিলেন। তাঁর পবিত্র মনকে বেঁধে দিলেন ঈশ্বরীয় ভাবে, উঁচু সুরে। শ্রীশ্রীমাও জানলেন তাঁর সাধক পতিকে, যিনি তাঁর মধ্যে আনন্দময়ী ভবতারিণীকেই দর্শন করেন। এ যেন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত—শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের উত্তরাধিকার অর্পণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সমাপ্ত হল মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে। শ্রীমা ষোড়শীপূজা গ্রহণ করলেন। হলেন ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নহবতের নিভৃতে তাঁর তপশ্চরণ। অনতিদূরেই ব্রহ্মস্বরূপ অবতারের নিত্য লীলাবিলাস। অন্তরালে থেকেও মায়ের সূক্ষ্ম শুদ্ধ মন মগ্ন থাকত পুরুষোত্তমের নব নব লীলায়। সতৃষ্ণ নিরীক্ষণে আনন্দে ভরপুর তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি যেন নিত্যনতুন ভাবে জানছিলেন। একই শয্যায় শয়নকালে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য মূর্তি। এত কাছ থেকে তাঁর দিব্যভাব, সমাধি, ভাবে হাসিকান্না প্রভৃতি তরুণীবধূর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের এক অভূতপূর্ব পরিচয় উন্মোচন করল। ওই দিব্যভাব, আবেশ দেখে তাঁর সর্বশরীর কাঁপত। নিজের অনন্তভাবময় স্বরূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করালেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। শিখিয়ে দিলেন কোন ভাব দেখলে কী বীজ, কী নাম শোনাতে হবে। কখনও বা ঠাকুরের ভাবে অংশ নিয়েও মা উল্লসিতা হতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের অংশীদার শ্রীশ্রীমা তখনই অনন্ত ভাবরাজ্যের পাঠ নিয়েছিলেন। তাই ধীরে ধীরে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ভাব বুঝে চলবার এক স্বাভাবিক শক্তি তাঁর মধ্যে দেখা যেত, এমনকী তিনি খাওয়ার সময় তাঁকে নানান কথায় ভুলিয়ে সমাধি থেকে তাঁর মন নামিয়ে রাখতেও পারতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এবারের ভাব ছিল মাতৃভাবে সাধন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধটিকে প্রথমেই তিনি স্থির করে সেই ভাবে জীবনের সুর বেঁধে নিয়েছিলেন। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন সারদা—''আমি তোমার কে হই?'' উত্তরটি সকলেই জানেন। বধূকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরাধ্য দেবী ভবতারিণীর আনন্দময়ীরূপ বলে সত্য সত্য জানতেন। তাঁর বোধ এবং বাক্য দুই-ই অমোঘ।

ক্রমে ক্রমে ত্যাগীশ্বর, মহাসংযমী, জিতেন্দ্রিয় মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ সারদার চেতনায় মূর্ত হলেন। মাতৃগতপ্রাণ ভাবস্থ সাধকের অতি স্বাভাবিক কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের পরিচয় মা হৃদয়ঙ্গম করলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার প্রাঙ্গণে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষার সম্মুখীন তিনি। একদিন দুপুরে আহারের পর নহবতে গিয়ে ঠাকুর শ্রীমার কাছে মশলা চাইলেন। মা একটু মশলা তাঁকে খেতে দিয়ে, অবশিষ্ট জোয়ান-মৌরি কাগজে মুড়ে তাঁর হাতে দিলেন। কিন্তু তার ফল হল সাংঘাতিক। সাধুর সঞ্চয়ে অধিকার নেই, সুতরাং সত্যসন্ধ ঠাকুর কী এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে ঘরের দিকে না গিয়ে গঙ্গার দিকে গেলেন এবং অর্ধবাহ্যদশায় 'মা ডুবি? মা ডুবি?' বলতে বলতে একেবারে কিনারায় চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা লোকসমক্ষে বার হন না, তাই নহবতে ছটফট করছেন। শেষপর্যন্ত খবর পাঠাতে হৃদয় এঁটো হাতে ছুটে এসে ঠাকুরকে ধরলেন। মায়ের চিত্তে এই ঘটনা গভীর দাগ কেটেছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ি ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে দশহাজার টাকা দিতে চাইলেন। ত্যাগীর বাদশা শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় যেন কেউ করাত বসিয়ে দিল। মায়ের মন বোঝার জন্য তিনি বললেন, ''তুমি ওটা নাও না কেন?'' অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং ঠাকুরের ত্যাগের পথের সঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সোজাসুজি বললেন, ''তোমাকে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য।'' আর তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাতেই টাকা খরচ করবেন। ঠাকুর সেদিন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যে ত্যাগীশ্বরকে মর্মে মর্মে চিনে চিরকাল তাঁরই অনুবর্তিনী থাকবেন—একথা বুঝেও তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

মা ঠাকুরকে কতটা বুঝেছেন তার পরীক্ষাও ঠাকুর নিয়েছিলেন। মায়ের অসাধারণ উত্তরে আমরাও হতবাক হই। একবার মায়ের মন্দির থেকে মাতালের মতো টলতে টলতে ঘরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে দেখে তাঁর শ্রীঅঙ্গ ঠেলে বললেন, ''ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'' মা স্তম্ভিত হয়ে তখনই উত্তর দিলেন, ''না, না, মদ খাবে কেন?'' ''তবে কেন টলছি, তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি মাতাল?'' মা শশব্যস্তে উত্তর দিলেন—''না, না, তুমি মদ কেন খাবে ? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'' ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও ভাবরাজ্যের অধীশ্বরকে তিনি অপূর্ব সত্যটি শুনিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মায়ের ধারণা-ভাবনা যে কত স্বচ্ছ ছিল তারই উদাহরণ এটি।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর ছোট একটি বাক্যে মা নিজ অন্তরের বৈরাগ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র রূপটি : ''এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন; দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।'' এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে 'শাশ্বত চিন্ময় বিগ্রহ'। পূর্ব পূর্ব অবতারলীলার সঙ্গে তিনি যেন ধীরে ধীরে একীভূত হলেন। শ্রীমা বৃন্দাবনে, অযোধ্যায় পূর্ব পূর্ব লীলার সঙ্গে যেমন একাত্মতা লাভ করলেন, তেমনই অনুভব করলেন যুগে যুগে অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণই এসেছেন। আর যুগান্তরের সঙ্গিনী স্বয়ং তিনি মহাশক্তিরূপে তাঁর লীলার অনুগামিনী হয়েছেন।

পরের দিকে কোঠারে আনমনে শ্রীশ্রীমার উক্তি প্রমাণ করে লীলা সম্বন্ধে তিনি কতই না সচেতন ছিলেন : ''এই ঠাকুর বার বার—একই চাঁদ রোজ রোজ। নিস্তার নেই—ধরা পড়া আছেন। তাঁরই জীব। তিনি দেখবেন না তো কে দেখবে, ও পাড়ার লোকে এসে? বলেছেন, 'যখনি ডাকবি মোরে, এসে দেখা দিব তোরে'।—এইটি মনে রেখো—কখনও ভুলো না—ডাকলেই পাবে—তিনি যে কল্পতরু!''

শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম ভক্তবাৎসল্য। তাঁর এবারের সহজলীলায় যে সকলেরই স্থান, সকলেরই ডাকে তিনি সাড়া দেবেন—এ-অঙ্গীকার মা স্বয়ং করে গেছেন। একদিন বলছেন, ''বলে, বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সহিবে কদিন—এ কি খালি জীবের—এ যে ঠাকুরের! তাই বসে বসে ভাবছিলুম। দেখলুম, শেষ নেই। কি কষ্ট ঠাকুরের—কে বুঝবে?'' ''এক এক বার মনে হয়, জীবের ধার কি শোধ হবে না? আবার ভাবি—না, এ-ধার তো শোধ হবার নয়—দাঁতে কুটো কেটেও নয়—জীব যে তাঁর!''

অবতরণের গভীর কষ্টভোগ অথচ তারই মধ্যে তিনি আনন্দময়—জীবের দুঃখমোচনে সর্বস্বহারা। লীলার পরিসর যেন ক্রমশ আরও ব্যাপক হয়ে তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে : ''যেদিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর—কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই সৃষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোনও কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়।'' তোতাপুরীর অনুভবের সঙ্গে কোথায় যেন মিল খুঁজে পাই। তিনি দেখেছিলেন মা-ই সব হয়েছেন, দুঃখ-যন্ত্রণা-মৃত্যু—সব। মা পিঁপড়ের মধ্যেও ঠাকুরকে দর্শন করছেন, আর সকলকে উদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন, কারণ 'সব জীব যে ঠাকুরের', অথবা তিনিই জীবে জীবে অধিষ্ঠান করছেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে মায়ের ধারণা লীলার সীমা অতিক্রম করে নিত্যে প্রসারিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপার অনন্ত মহিমা তিনি যে কতভাবে অনুভব করেছিলেন সে-রহস্য আমাদের গোচর নয়। তাই যখন মায়াবতী থেকে স্বামীজীর শিষ্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে মাকে চিঠি দেন তখনই চকিতে আমরা পরিচয় পাই অন্য জননীর যিনি ব্রহ্মশক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ—''তোমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত। তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।''

এবার শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় শ্রীমায়ের ভূমিকা অভূতপূর্ব। জগদ্‌গুরু এবার নবতম লীলার দায় অর্পণ করেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-মন ত্রিগুণাত্মক জগতের সংস্পর্শ সইতে পারবে না। তাই স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার ওপর তারণকাজের সিংহভাগ সমর্পণ। শ্রীমার মধ্যে এবার বগলা দেবীর সংহারশক্তি, সরস্বতীর শান্তভাব এবং ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা মিলিত। যুগাবতার স্বয়ং এই শক্তির উদ্বোধন করেন ষোড়শীপূজার কালে। মায়ের দেহে ও মনে তাঁকে আহ্বান করে জগৎকল্যাণে প্রবুদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা জানান। বলা চলে, শ্রীশ্রীমা এই অদ্ভুত পূজা গ্রহণ করে নীরবে নিজ সত্তায় মিশিয়ে যুগাবতারের লোককল্যাণ-কার্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু জানা বা বোঝা নয়, তাঁর সত্তাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে সেটি গ্রহণ মনে হলেও তা আসলে গ্রহণ নয়। বলা যায়, তাঁর মধ্যে যে-শক্তি নিহিত ছিল তার বিশাল স্ফুরণ ঘটল। তাঁরা ছিলেন অভেদ, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।